কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৫

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৩

সূরা তাগাবুত ১-১০ আয়াত

সূরা আত-তাগাবুন কুরআনের ৬৪ তম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৮ এবং রূকু সংখ্যা ২। সূরা আত-তাগাবুন মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরার নামের অর্থ- মোহ অপসারণ।

নামকরণ:

সূরার ৯নং আয়াতের ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ কথাটির التَّغَابُنِ শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে التَّغَابُنِ শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল :

মুকাতিল এবং কালবী বলেন, সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আতা ইবনে ইয়াসির বলেন: প্রথম থেকে ১৩ আয়াত পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১৪ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত মদীনায় অবতীর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। যদিও সূরার মধ্যে এমন কোন ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তবে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত সূরাটি মাদানী যুগের প্রথমদিকে নাযিল হয়ে থাকবে। এ কারণে সূরাটিতে কিছুটা মক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য এবং কিছুটা মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য:

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈমান ও আনুগত্যের দাওয়াত এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া। বক্তব্যের ধারাক্রম হচ্ছে: প্রথম চার আয়াতে গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। ৫ থেকে ১০ আয়াতে যারা কুরআনের দাওয়াত মানে না তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং যারা কুরআনের এ দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে ১১ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করে চারটি মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, এই বিশ্ব-জাহান যেখানে তোমরা বসবাস করছো তা আল্লাহহীন নয়। বরং সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী এমন এক আল্লাহ এর স্রষ্টা, মালিক ও শাসক যিনি যে কোন বিচারে পূর্ণাঙ্গ এবং দোষত্রুটি ও কলুষ-কালিমাহীন। এ বিশ্ব-জাহানের সবকিছুই তাঁর সে পূর্ণতা, দোষ-ত্রুটিহীনতা এবং কলূষ-কালিমাহীনতার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, এই বিশ্ব-জাহানকে উদ্দেশ্যহীন ও অযৌক্তিকভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এর সৃষ্টিকর্তা একে সরাসরি সত্য, ন্যায় ও যুক্তির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। এখানে এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত থেকো না যে, এই বিশ্ব-জাহান অর্থহীন এক তামাশা, উদ্দেশ্যহীনভাবে এর সূচনা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে তা শেষ হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং কুফর ও ঈমান গ্রহণ করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এটা কোন নিষ্ফল ও অর্থহীন ব্যাপার নয় যে, তোমরা কুফরী অবলম্বন করো আর ঈমান অবলম্বন করো কোন অবস্থাতেই এর কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না। তোমরা তোমাদের এই ইখতিয়ার ও স্বাধীনতাকে কিভাবে কাজে লাগাও আল্লাহ তা দেখছেন।

চতুর্থত বলা হয়েছে, তোমরা দায়িত্বহীন নও বা জবাবদিহির দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত নও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেই সত্তার সম্মুখীন হতে হবে যিনি বিশ্ব-জাহানের সবকিছু সম্পর্কেই অবহিত। তোমাদের কোন কথাই তাঁর কাছে গোপন নয়, মনের গহনে লুক্কায়িত ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তাঁর কাছে সমুজ্জল ও সুস্পষ্ট।

বিশ্ব-জাহান এবং মানুষের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে এই চারটি মৌলিক কথা বর্ণনা করার পর বক্তব্যের মোড় সেই সব লোকদের প্রতি ঘুরে গিয়েছে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। ইতিহাসের সেই দৃশ্যপটের প্রতি তাদের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানব ইতিহাসে একের পর এক দেখা যায়। অর্থাৎ এক জাতির পতনের পর আরেক জাতির উত্থান ঘটে এবং অবশেষে সে জাতিও ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধির মাপকাঠিতে ইতিহাসের এ দৃশ্যপটে হাজারো কারণ উল্লেখ করে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর পেছনে কার্যকর প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন। তা হচ্ছে, জাতিসমূহের ধ্বংসের মৌলিক কারণ শুধু দু'টি:

একটি কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্য যেসব রসূল পাঠিয়েছিলেন তারা তাঁদের কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফল হয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা নানা রকম দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করে একটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তি থেকে আরেকটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

দুই: তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারটিও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুসারে মনে করে নিয়েছে যে, এই দুনিয়ার জীবনই সবকিছু। এ জীবন ছাড়া এমন আর কোন জীবন নেই যেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এই ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস তাদের জীবনের সমস্ত আচার-আচরণকে বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের নৈতিক চরিত্র, কর্মের কলুষতা ও নোংরামি এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাব এসে তাদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পবিত্র ও ক্লেদমুক্ত করেছে। মানব ইতিহাসের এ দু'টি শিক্ষামূলক বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে ন্যায় ও সত্য অস্বীকারকারীদের আহবান জানানো হচ্ছে যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। আর তারা যদি অতীত জাতিসমূহের অনুরূপ পরিণামের সম্মুখীন হতে না চায় তাহলে আল্লাহ তাঁর রসূল এবং কুরআন মজীদ আকারে হিদায়াতের যে আলোকবর্তিকা আল্লাহ দিয়েছেন তার প্রতি যেন ঈমান আনে। সাথে সাথে তাদেরকে এ বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে যে, সেদিন অবশ্যই আসবে যখন আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের হার-জিতের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারপর কে ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করেছিল আর কে কুফর ও মিথ্যার পথ অনুসরণ করেছিল তার ভিত্তিতেই সমস্ত মানুষের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। প্রথম দলটি চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হবে এবং দ্বিতীয় দলটির ভাগে পড়বে স্থায়ী জাহান্নাম।

এরপর ঈমানের পথ অনুসরণকারীদের উদ্দেশ্য করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে:
এক: দুনিয়াতে যে বিপদ-মুসিবত আসে তা আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদনক্রমেই আসে। এরূপ পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি ঈমানের ওপর অবিচল থাকে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অস্থির ও ক্রোধান্বিত হয়ে ঈমানের পথ থেকে সরে যাবে, তার বিপদ-মুসিবত তো মূলত আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া দূরীভূত হবে না; তবে সে আরো একটি বড় মুসিবত ডেকে আনবে। তাহলো, তার মন আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

দুই: শুধু ঈমান গ্রহণ করাই মু'মিনের কাজ নয়। বরং ঈমান গ্রহণ করার পর তার উচিত কার্যত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা। সে যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিজের ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বিধান পৌঁছিয়ে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

তিন: এক মু'মিন বান্দার ভরসা ও নির্ভরতা নিজের শক্তি অথবা পৃথিবীর অন্য কোন শক্তির ওপর না হয়ে কেবল আল্লাহর ওপর হতে হবে।

চার: মু'মিনের জন্য তার অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, ও সন্তান-সন্তুতি একটা বড় পরীক্ষা। কারণ ঐগুলোর ভালবাসাই মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সে জন্য ঈমানদার ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তুতি সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে যাতে করে তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনভাবেই তাদের জন্য আল্লাহর পথের ডাকাত ও লুটেরা হয়ে না বসে। তাছাড়া তাদের উচিত অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করা যাতে তাদের মন-মানসিকতা অর্থ পূজার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

পাঁচ: প্রত্যেক মানুষ তার সাধ্যানুসারে শরীয়াতের বিধি-বিধান পালনের জন্য আদিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছে তার শক্তি ও সামর্থ্যের অধিক কিছু করার দাবি করেন না। তবে একজন মু'মিনের যা করা উচিত তাহলো, সে তার সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করতে কোন ত্রুটি করবে না এবং তার কথা, কাজ ও আচার-আচরণ তার নিজের ত্রুটি ও অসাবধানতার জন্য যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ অতিক্রম না করে।

সূরার ফযিলত

খালিদ ইবনু মা'দান হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঘুমের পূর্বে 'মুসাব্বিহাত' (যে সকল সূরা শুরু 'সাব্বাহা বা ইউসাব্বিহু' দিয়ে) পাঠ করতেন এবং তিনি বলতেন: "এগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা এক হাজার আয়াতের সমান।" সুনান আদ-দারেমী ৩৪৬৩

ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়ন করার আগে শুরুতে তসবীহ (সুবহা-না, সাব্বাহা, য়্যুসাব্বিহু, ও সাব্বিহ) বিশিষ্ট (বনী ইসরাঈল, হাদীদ, হাশর, সাফ্, জুমুআহ, তাগাবুন, ও আ'লা এই সাতটি) সূরা পাঠ করতেন। তিনি বলেন, ঐ সূরাগুলির মধ্যে এমন একটি আয়াত নিহিত আছে যা এক হাজার আয়াত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (আহমাদ ১৭২৯২, আবূ দাঊদ ৫০৫৭, তিরমিযী ২৯২১)

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

১. আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, আধিপত্য তারই এবং প্রশংসা তারই; আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

যে কয়টা সূরা يسبح, سبح দ্বারা শুরু করা হয়েছে তার মধ্যে এটা সর্বশেষ সূরা। এইসূরাগুলোকে মুসাব্বিহাত সূরা বলা হয়।

যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে,

এ আয়াতাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করার কারণ পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে আপনা থেকেই বোধগম্য হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে বিশ্ব-জাহান এবং মানুষ সৃষ্টির যে তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, এর স্রষ্টা, মালিক ও শাসক একমাত্র আল্লাহ। তিনি এই বিশ্ব-জাহানকে অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। তাছাড়া মানুষকে এখানে দায়িত্বহীন বানিয়েও ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, সে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবে অথচ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ থাকবে না। এই বিশ্ব-জাহানের শাসক এমন কোন বেখবর বাদশাহও নন যে, তাঁর সাম্রাজ্যে যা কিছু ঘটেছে তা তাঁর আদৌ জানা থাকবে না। এ ধরণের বিষয়বস্তু বর্ণনা করার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সূচনা কথা বা ভূমিকা যা হতে পারতো সংক্ষিপ্ত এ আয়াতাংশে তাই বলা হয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে এই ভূমিকা বা সূচনা কথার অর্থ হলো, পৃথিবী থেকে শুরু করে মহাকাশের সর্বশেষ বিস্তৃত পর্যন্ত যেদিকেই তাকাও না কেন যদি তোমরা বিবেক বুদ্ধিহীন না হয়ে থাকো তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, পরমাণু থেকে নিয়ে বিশাল ছায়াপথ পর্যন্ত সবকিছুই শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্যই দিচ্ছে না বরং তিনি যে সব রকম দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা এবং ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র সে সাক্ষ্যও দিচ্ছে। তাঁর সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর কাজকর্ম ও আদেশ-নিষেধসমূহে যদি কোন প্রকার কলুষ-কালিমা ও ভুল-ত্রুটি কিংবা কোন দুর্বলতা ও অপূর্ণতার নামমাত্র সম্ভাবনাও থাকতো তাহলে চরম পূর্ণতাপ্রাপ্ত এই যুক্তিভিত্তিক ও জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা আদিকাল থেকে অন্তকাল পর্যন্ত এই অলংঘনীয় ও অবিচল পন্থায় চলা তো দূরের কথা অস্তিত্ব লাভ করতেও পারতো না।

আধিপত্য তারই

অর্থাৎ এ গোটা বিশ্ব-জাহান তাঁরই সাম্রাজ্য। তিনি একে সৃষ্টি করে এবং একবার চালু করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনিই এর ওপর কার্যত সার্বক্ষণিক শাসন পরিচালনা করছেন। এই শাসন ও কর্তৃত্বে অন্য কারো আদৌ কোন অংশ বা অধিকার নেই। এই বিশ্ব-জাহানের কোন জায়গায় কেউ যদি সাময়িকভাবে সীমিত পর্যায়ে ক্ষমতা কিংবা মালিকানা অথবা শাসন

কর্তৃত্ব লাভ করে থাকে তাহলে তা তার নিজের শক্তিতে অর্জিত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নয় বরং আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ার। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তা তার অধিকারে থাকে এবং যখনই চান তা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন।

প্রশংসা তারই; আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান

অন্য কথায় তিনি একাই কেবল প্রশংসার যোগ্য। অন্য আর যার মাধ্যমে প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ বা সৌন্দর্য আছে তা তারই দেয়া। আর حمد শব্দকে যদি শোকর বা কৃতজ্ঞতা অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে শোকর ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার প্রকৃত অধিকারীও কেবল তিনিই। কারণ সমস্ত নিয়ামত তাঁরই সৃষ্টি এবং সমস্ত সৃষ্টিরও প্রকৃত উপকারী ও কল্যাণদাতাও তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন উপকারের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তা করি এই জন্য যে, ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। অন্যথায় সে যেমন এই নিয়ামতের স্রষ্টা নয়, তেমনি আল্লাহর দেয়া তাওফীক ও সামর্থ্য ছাড়া সে ঐ নিয়ামত আমাদের কাছে পৌঁছাতেও সক্ষম হতো না।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মুমিন। আর তোমরা যে আমল করা আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং কেউ হয় মু'মিন' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তার মধ্যে ঈমান ও কুফর দুটি উপাদান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন। তবে প্রত্যেক সন্তান যখন জন্ম নেয় তখন ঈমানের তথা ইসলামের ওপর জন্ম নেয়। (সহীহ বুখারী হা. ১৩৮৫) অতঃপর সে সন্তান যে পরিবেশে বড় হয় সে ধর্মেরই অনুসরণ করে থাকে। অর্থাৎ যদি সে ইসলামী পরিবেশ পায় তাহলে মুসলিম হয় আর কুফরী পরিবেশ পেলে কাফির হয়।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে মু'মিন ও কাফির বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন আবার কিয়ামতের দিন কাফির ও মু'মিন হিসাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনকে তার মায়ের গর্ভে কাফির হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন, আর ইয়াহইয়াকে তার মায়ের পেটে মু'মিন হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন। (সিলসিলা সহীহাহ হা. ১৮৩১)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : তোমাদের কেউ জান্নাতবাসী হওয়ার আমল করতেই থাকে এমনকি তার ও তার মৃত্যুর মাঝে এক বিঘত বা একহাত বাকী থাকে এমন সময় তার তাকদীর তার আমলের ওপর প্রাধান্য লাভ করে ফলে সে জাহান্নামবাসীদের আমল করে ফেলে যার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। তোমাদের কেউ জাহান্নামবাসী হওয়ার আমল করতেই থাকে এমনকি তার ও তার মৃত্যুর মাঝে এক বিঘত বা এক হাত বাকি থাকে এমন সময় তার তাকদীর তার আমলের ওপর প্রাধান্য লাভ করে ফলে সে জান্নাতবাসীদের আমল করে আর জান্নাতে চলে যায়। (সহীহ বুখারী হা. ৩৩৩২, সহীহ মুসলিম হা. ২৬৪৩)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন। আর যাওয়া তো তারই কাছে।

এই আয়াতে গভীর যৌক্তিক সম্পর্কের পারম্পর্য ও ক্রমানুসারে তিনটি কথা বলা হয়েছেঃ

প্রথম কথাটি বলা হয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্ব-জাহানকে যথাযথ ও যৌক্তিক পরিণতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। بالحق শব্দটি যখন কোন খবর সম্পর্কে বলা হয় তখন তার অর্থ হয় সত্য খবর। হুকুম বা নির্দেশের জন্য বলা হলে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক হুকুম বা নির্দেশ, কথার ব্যাপারে বলা হলে তার অর্থ হয় সত্য ও সঠিক কথা এবং কোন কাজ সম্পর্কে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় এমন কাজ যা বিজ্ঞোচিত ও যুক্তিসঙ্গত, অনর্থক ও অযথা কাজ নয়। এটা স্পষ্ট যে, خلق বা সৃষ্টি করা একটি কাজ। তাই বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করাকে যথাযথ ও যৌক্তিক বলার অনিবার্য অর্থ এই যে, এই বিশ্ব-জাহানকে খেল-তামাশার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এটি একজন বিজ্ঞ স্রষ্টার একান্ত সুচিন্তিত কাজ। এর প্রতিটি বস্তুর পেছনে একটি যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য আছে। এসব সৃষ্টির মধ্যে এই উদ্দেশ্যবাদ এতই সুস্পষ্ট যে, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষ যদি এর কোনটির রূপ প্রকৃতি ভালভাবে বুঝতে পারে তাহলে ঐ জিনিস সৃষ্টির যৌক্তিক ও বিজ্ঞোচিত উদ্দেশ্য কি হতে পারে তা জানা তার জন্য কঠিন কাজ নয়। পৃথিবীতে মানুষের সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, গভীর চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা এবং অনুসন্ধান দ্বারা মানুষ যে জিনিসেরই রূপ-প্রকৃতি বুঝাতে সক্ষম হয়েছে শেষ পর্যন্ত ঐ জিনিস সম্পর্কে সে একথাও জানতে পেরেছে যে, তা কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আর সেই উদ্দেশ্যকে জানা ও বুঝার পরই সে এমন অসংখ্য জিনিস আবিষ্কার করেছে যা বর্তমানে মানব সভ্যতার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বিশ্ব-জাহান যদি কোন ক্রীড়ামোদীর খেলার উপকরণ হতো এবং এর মধ্যে কোন যুক্তি ও উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল না থাকতো তাহলে এসব আবিষ্কার উদ্ভাবন কখনো সম্ভব হতো না।

দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, আল্লাহ এই বিশ্ব-জাহানে মানুষকে সর্বোত্তম আকার আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আকার আকৃতি অর্থ শুধু মানুষের চেহারা নয়। বরং এর অর্থ তার গোটা দৈহিক কাঠামো এবং দুনিয়াতে কাজ করার জন্য তাকে দেয়া সব রকম শক্তি ও যোগ্যতা ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই দু'টি দিক দিয়ে মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ কারণেই সে পৃথিবী ও তার আশেপাশের সমস্ত সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার যোগ্য হয়েছে। তাকে দীর্ঘ দেহ কাঠামো দেয়া হয়েছে, চলাফেরার জন্য উপযুক্ত পা দেয়া হয়েছে এবং কাজ-কর্ম করার জন্য উপযুক্ত হাত দেয়া হয়েছে। তাকে এমন সব ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান আহরণ যন্ত্র দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে সব রকম তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তাকে চিন্তা-ভাবনা করার, বুঝার এবং বিভিন্ন তথ্য একত্র করে তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত উন্নত পর্যায়ের একটি মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি দেয়া হয়েছে। তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি এবং ভালমন্দ ও ভুল শুদ্ধ নিরূপক শক্তি দেয়া হয়েছে। তাকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে নিজেই তার চলার পথ বেছে নেয় এবং কোন পথে সে তার চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করবে আর কোন পথে করবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাকে এতটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে তার স্রষ্টাকে মানতে এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করতে পারে, কিংবা তাঁকে অস্বীকার করতে পারে কিংবা যাদেরকে ইচ্ছা সে তার খোদা বানিয়ে নিতে পারে অথবা যাকে সে খোদা বলে স্বীকার করে ইচ্ছা করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। এসব শক্তি এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আর কার্যত সে এ ক্ষমতা প্রয়োগও করছে।

ওপরে বর্ণিত এ দু'টি কথার যৌক্তিক ফলাফল হিসেবে এই আয়াতের তৃতীয় অংশে বর্ণিত কথাটি আপনা থেকেই এসে পড়ে। আয়াতটির এই অংশে বলা হয়েছেঃ "অবশেষে তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" একথা স্পষ্ট যে, এরূপ একটি যুক্তিসঙ্গত ও উদ্দেশ্যমূলক বিশ্ব-ব্যবস্থায় এমন স্বাধীন একটি সৃষ্টিকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছে তখন যুক্তির দাবী কখনো এটা হতে পারে না যে, তাকে এখানে দায়িত্বহীন বানিয়ে লাগামহীন উটের মত ছেড়ে দেয়া হবে। বরং এর অনিবার্য দাবী হবে যিনি তাকে ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা দিয়ে তাঁর সৃষ্ট জগতে এই মর্যাদা ও অবস্থান দিয়েছেন তাঁর সামনে সে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। এই আয়াতে উল্লেখিত "ফিরে যাওয়া" এর অর্থ নিছক ফিরে যাওয়া নয়, বরং এর অর্থ জবাবদিহির জন্য ফিরে যাওয়া। পরবর্তী আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এই ফিরে যাওয়াটা পার্থিব এই জীবনে হবে না বরং মৃত্যুর পরের আরেকটি জীবন হবে। গোটা মানবজাতিকে পুনরায় জীবিত করে হিসেব-নিকেশ গ্রহণের জন্য যখন এক সাথে একই সময়ে জড়ো করা হবে, সেটি হবে এর প্রকৃত সময়। আর সেই হিসেব-নিকেশের

ফলাফল স্বরূপ পুরস্কার ও শাস্তির ভিত্তি হবে মানুষ আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সঠিক পন্থায় কাজে লাগিয়েছে, না ভুল পন্থায় কাজে লাগিয়েছে তার ওপর। এখন প্রশ্ন হলো, জবাবদিহির এই কাজটি দুনিয়ার বর্তমান এই জীবনে হওয়া সম্ভব নয় কেন? আর এর প্রকৃত সময় মৃত্যুর পরের জীবনই বা কেন? তাছাড়া এ পৃথিবীর গোটা মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আগের ও পরে সব মানুষকে যে সময় পুনরায় জীবিত করে জড়ো করা হবে সে সময়টিই বা এর প্রকৃত সময় হবে কেন? মানুষ যদি বিবেক-বুদ্ধিকে কিছুটা কাজে লাগায় তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এ সবই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। সে এ কথাও বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির দাবী হলো, মানুষের হিসেব-নিকেশ ও জবাবদিহির কাজটি মৃত্যুর পরের জীবনেই হওয়া দরকার এবং সমস্ত মানুষের এক সাথে হওয়া দরকার। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তার গোটা জীবনের কাজকর্মের জন্য। তাই তার জীবনের সমস্ত কাজকর্ম ও দায়িত্ব-কর্তব্যের জন্য জবাবদিহির সঠিক ও অনিবার্য সময় সেটিই হওয়া উচিত যখন তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষের কাজ-কর্মের ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব ফেলে এবং প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সৃষ্টি করে, তেমনি তার মৃত্যুর পরেও তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এসব ফলাফল, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার জন্য সে-ই দায়ী। তাই সঠিক জবাবদিহি ও হিসেব-নিকেশ কেবল তখনই হতে পারে যখন গোটা মানবজাতির জীবন কর্মের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একই সময়ে একত্রিত করা হবে।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

৪. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী।

তিনি শুধু সেই সব কাজ-কর্ম সম্পর্কেই অবগত নন যা মানুষের গোচরে আসে বরং সেই সব কাজ-কর্ম সম্পর্কেও তিনি অবহিত যা সবার কাছেই গোপন থাকে। তাছাড়াও তিনি শুধু কাজ-কর্মের বাহ্যিক রূপটাই দেখেন না বরং মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে কি ধরণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল, সে যা করেছে তা কি নিয়তে করেছে এবং কি বুঝে করেছে তাও তিনি জানেন। এটা এমন এক সত্য, যে বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, ইনসাফ ও সুবিচার কেবল আখেরাতেই হতে পারে এবং শুধু আল্লাহ তা'আলার আদালতেই ইনসাফ হওয়া সম্ভব।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৫. ইতোপূর্বে যারা কুফরী করেছে তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? অতঃপর তারা তাদের কাজের মন্দ ফল আস্বাদন করেছিল। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এখানে বিশেষ করে মক্কাবাসী এবং সাধারণভাবে আরবের কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর পূর্বের কাফের বলতে নূহ (আঃ)-এর জাতি, আ'দ সম্প্রদায় এবং সামুদ সম্প্রদায় ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। যাদেরকে তাদের কুফরী ও অবাধ্যতার কারণে দুনিয়াতে আযাব দিয়ে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার আযাব ছাড়াও আখেরাতের আযাবও তাদের জন্য প্রস্তুত আছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

৬. তা এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগন সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসত তখন তারা বলত, মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দেবে? অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আল্লাহ্ও (তাদের ঈমানের ব্যাপারে) ভ্রুক্ষেপহীন হলেন; আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।

মূল আয়াতে ‘বাইয়েনাত’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আরবী ভাষায় بين বলা হয় এমন জিনিসকে যা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। নবী-রসূলগণ بينات আসতেন এ কথার অর্থ প্রথমত এই যে, তাঁরা এমনসব স্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে আসতেন যা সরাসরি প্রমাণ করতো, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। দ্বিতীয়ত, তাঁরা যেসব কথা পেশ করতেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে ও উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণাদিসহ পেশ করতেন। তৃতীয়ত, তাঁদের শিক্ষায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না, বরং হক কি এবং বাতিল কি, জায়েজ কি এবং নাজায়েয কি এবং কোন্ পথে মানুষের চলা উচিত আর কোন্ পথে চলা উচিত নয় তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তাঁরা বলে দিতেন।

তারা যখন আল্লাহর দেয়া হিদায়াতের পরোয়া করলো না তখন তারা গোমরাহীর কোন্ গহ্বরে পতিত হতে যাচ্ছে, আল্লাহও তার পরোয়া করলেন না। কোন ব্যাপারেই আল্লাহ তাদের কাছে ঠেকা ছিলেন না যে, তারা তাঁকে খোদা হিসেবে মানলে তবেই তিনি খোদা থাকবেন অন্যথায় তাঁর কর্তৃত্বের আসন হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তিনি তাদের ইবাদাত-বন্দেগীরও মুখাপেক্ষী নন কিংবা প্রশংসা ও স্তব-স্তুতিরও মুখাপেক্ষী নন। তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই তিনি তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথ দেখাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহও তাদের প্রতি বিমুখ হয়ে গেলেন। এরপর আল্লাহ তাদেরকে না হিদায়াত দিয়েছেন, না রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, না তাদেরকে ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং না নিজেদের ওপর ধ্বংস ডেকে আনা থেকে বাঁধা দিয়েছেন। কারণ তারা নিজেরাই তাঁর হিদায়াত ও বন্ধুত্ব লাভের আকাঙ্খী ছিল না।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

৭. কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। বলুন, অবশ্যই হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

কাফির-মুশরিকদের প্রকৃত জ্ঞান, হিদায়াত ও সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী কিতাব উপস্থিত না থাকায় তারা যেসব বাতিল ধারণা করে ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা এখানে আলোকপাত করেছেন।

কুরআন মাজীদের তিন জায়গায় মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি তোমার প্রতিপালকের কসম খেয়ে ঘোষণা দাও যে, মহান আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন। তার মধ্যে একটি জায়গা হল এই আয়াতে। দ্বিতীয়টি হল সূরা ইউনুসের ৫৩ নং আয়াতে এবং তৃতীয়টি হল, সূরা সাবার ৩নং আয়াতে।

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যৌক্তিকতা হল- মহান আল্লাহ মানুষকে পুনরায় জীবিত এই জন্য করবেন যে, যাতে সেখানে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেওয়া যায়। কেননা, দুনিয়াতে আমরা দেখি যে, এই বদলা পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। না নেককার পায়, না বদকার। এখন কিয়ামতেও যদি পূর্ণ প্রতিদানের কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে দুনিয়া খেলোয়াড়দের খেলার স্থান এবং একটি অনর্থক জিনিসই বিবেচিত হবে। অথচ মহান আল্লাহর সত্তা এ সব থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর তো কোন কাজই অনর্থক নয়। তাহলে জ্বিন ও ইনসানের সৃষ্টি বিনা উদ্দেশ্যে কেবল এক প্রকার খেল-তামাশা কিভাবে হতে পারে?

দ্বিতীয়বার জীবিত করা মানুষদের কাছে যতই কঠিন অথবা অসম্ভব মনে হোক না কেন, আল্লাহর কাছে তা অতি সহজ ব্যাপার।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে নূর আমরা নাযিল করেছি তাতে ঈমান আন। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

فَآمِنُوا তে 'ফা' অক্ষরটিকে বলা হয় 'ফা ফাসীহাহ' (যার অর্থঃ অতএব, সুতরাং, তাহলে) যা প্রমাণ করছে যে, এর পূর্বে কোন শর্ত উহ্য আছে। অর্থাৎ, ব্যাপার যখন এই রকমই যা বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং তাঁকে সত্য বলে মানো।

নবী (সাঃ)-এর সাথে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা হল এই কুরআন মাজীদ। যার দ্বারা ভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়।

আলো যেমন নিজেই সমুজ্জল ও উদ্ভাসিত হয় এবং আশেপাশের অন্ধকারে ঢাকা সব জিনিসকে স্পষ্ট ও আলোকিত করে দেয় তেমনি কুরআন মজীদও এমন এক আলোকবর্তিকা যার সত্যতা আপনা থেকেই স্পষ্ট ও সমুজ্জল। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম যেসব সমস্যা বুঝার জন্য যথেষ্ট নয় কুরআনের আলোকে মানুষ সেসব সহজেই বুঝতে পারে। যার কাছেই এ আলোকবর্তিকা থাকবে সে চিন্তা ও কর্মের অসংখ্য আঁকাবাঁকা পথের মধ্যেও ন্যায় ও সত্যের সোজা পথ স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। এই সরল সোজা পথের ওপর সে সারা জীবন এমনভাবে চলতে পারবে যে, প্রতি পদক্ষেপে সে জানতে পারবে যে, গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাওয়ার মত ছোট ছোট পায়ে চলার পথ কোন কোন দিকে যাচ্ছে, ধ্বংসের গহ্বরসমূহ কোথায় কোথায় আসছে আর এসবের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার পথই বা কোনটি তাও সে জানতে পারবে।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

৯. স্মরণ করুন, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে সেদিন হবে লোকসানের দিন। আর যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য।

যেদিন আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। (لِيَوْمِ الْجَمْعِ) বা একত্রিত হওয়ার দিবস ও (يَوْمُ التَّغَابُنِ) লোকসানের দিবস- এই উভয়টি কেয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববতী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করা হবে। [ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে التَّغَابُن শব্দটি غبن থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غبن বলা হয়। تَغَابُن শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্যে বলা হয়, অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে, অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কেয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থাকবে না। কারও কোন দাবি থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।" [বুখারী: ২৪৪৯]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ও অন্যান্য তফসীরবিদ কেয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফের, পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না; বরং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশি সৎকর্ম করতাম, তবে জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্যে পরিতাপ করবে; যা অযথা ব্যয়

করেছে। হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ না করে, কেয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।" [৪৮৫৮]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, "কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশের পর তাকে জাহান্নামে তার জন্য যে জায়গা রাখা হয়েছিল তা দেখানো হবে। ফলে তার কৃতজ্ঞতা বেড়ে যাবে, পক্ষান্তরে কোন জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করলে তাকে জান্নাতে তার জন্য যে স্থান ছিল তা দেখানো হবে, ফলে তার আফসোস বেড়ে যাবে।" [বুখারী: ৬৫৬৯]

এখানে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধু এ কথা মেনে নেয়া যে, আল্লাহ আছেন। বরং তার অর্থ হলো আল্লাহ নিজে, তাঁর রসূল এবং কিতাবের মাধ্যমে যেভাবে ঈমান আনতে বলেছেন সেভাবে ঈমান আনা। এর মধ্যে রিসালাত ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও আপনা থেকেই অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে মানুষ যে কাজকে নেকীর কাজ মনে করে অথবা মানুষের নিজের গড়ে নেয়া নৈতিক মানদণ্ড অনুসারে যেসব কাজ করে, নেকীর কাজ বলতে সেসব কাজকেও বুঝায় না। বরং এর দ্বারা বুঝায় এমন সব কাজ-কর্ম যা আল্লাহর দেয়া আইন মোতাবেক করা হয়। তাই পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব শুভ ফলাফল ও পরিণামের কথা বলা হয়েছে রসূল ও কিতাবের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে মানার ও নেক কাজ করার ফলাফল এবং পরিণামও তাই হবে কারো এমন ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তিই বুঝে শুনে কুরআন অধ্যয়ন করবে তার কাছে এ বিষয়টি গোপন থাকবে না যে, কুরআনের দৃষ্টিতে এ ধরণের কোন ঈমানের নাম আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং কোন কাজের নাম নেক কাজ আদৌ নয়।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

১০. আর যারা কুফুরী করে আর আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

কুফরী বলতে কি বুঝায়? এ কথাটিই তা স্পষ্ট করে দেয়। আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহকে আল্লাহর আয়াত বলে না মানা, ঐ আয়াতসমূহে যেসব সত্য তুলে ধরা হয়েছে তা স্বীকার না করা এবং তার মধ্যে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অস্বীকার ও অমান্য করাই হচ্ছে কুফরী। এরই ফলাফল ও পরিণাম পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফুটনোট

➢ ১ম আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র বিষয়ে আমরা চারটি বিষয় জানতে পারি-

- আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে
- সৃষ্টিজগতের ওপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র
- সকল প্রশংসা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র জন্য
- তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান

➢ ৩ নং আয়াতে তিনটি মূল বিষয় গভীর যৌক্তিক ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ বিশ্ব-জাহানকে যথাযথ ও যৌক্তিক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, যা অনর্থক বা খেলার উদ্দেশ্যে নয় বরং প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম আকার, গুণাবলি এবং ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তাকে পৃথিবীর অন্য সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার যোগ্যতা প্রদান করে। তৃতীয়ত, মানুষের এই শক্তি ও স্বাধীনতার পরিণতি হিসেবে তাকে আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে। এই জবাবদিহি মৃত্যুর পরের জীবনে হবে, যেখানে সমগ্র মানবজাতির কাজের চূড়ান্ত হিসেব-নিকেশ গ্রহণ করা হবে।

➢ সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং তাকে শ্রেষ্ঠতম আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে মানুষ আল্লাহর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি।

➢ আল্লাহ তায়ালা শুধু মানুষের গোপন কাজগুলো সম্পর্কেই অবহিত নন সেইসঙ্গে তার অন্তরের সকল কল্পনা ও ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কেও সম্যক অবহিত।

➢ মানুষ যদি জানতে পারে তাকে সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠে তার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়া হয়নি বরং তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর পর্যবেক্ষণে রয়েছে তাহলে সে অনর্থক কর্ম ও গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করবে এবং অর্থবহ ও নেক কাজ করার জন্য সচেষ্ট হবে।

➢ অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস অধ্যয়ন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পবিত্র কুরআনে বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

➢ কিছু পাপ কাজের শাস্তি আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়াতেই মানুষকে দেন। আর পরকালে রয়েছে ওই পাপের পূর্ণাঙ্গ শাস্তি।

➢ দম্ভ, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে মানুষ আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নবী পাঠিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হেদায়েতের যে মহা সুযোগ দান করেছিলেন তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

➢ ৬ নং আসমানী কিতাব বা ওহীকে বুঝাতে 'বাইয়েনাত' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এ কথার অর্থ তিনটি-

১. তাঁরা এমনসব স্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে আসতেন যা সরাসরি প্রমাণ করতো, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।

২. তাঁরা যেসব কথা পেশ করতেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে ও উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণাদিসহ পেশ করতেন।

৩. তাঁদের শিক্ষায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না, বরং হক কি এবং বাতিল কি, জায়েজ কি এবং নাজায়েয কি এবং কোন্ পথে মানুষের চলা উচিত আর কোন্ পথে চলা উচিত নয় তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তাঁরা বলে দিতেন।

➢ কেয়ামতকে এই সূরায় - (لِيَوْمِ الْجَمْعِ) বা একত্রিত হওয়ার দিবস ও (يَوْمُ التَّغَابُنِ) লোকসানের দিবস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

➢ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আগেই কিয়ামত দিবসের অনুতাপ থেকে বাঁচতে চাইলে আমাদেরকে নিজেদের ঈমান মজবুত করে যথাসম্ভব নেক আমল বা সৎকাজ করে যেতে হবে। তাহলে কিয়ামত দিবসে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে পারব।

➢ আল্লাহ তায়ালা মানুষের নেক আমলের ভিত্তিতে তাকে প্রতিদান দেবেন এবং সেইসঙ্গে ওই নেক আমলের ভিত্তিতে তার গোনাসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।

➢ জান্নাতে প্রবেশ করার আগে মানুষকে সব রকম গোনাহ ও কলুষতা থেকে মুক্ত করা হবে। হয় তাকে আল্লাহ সরাসরি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে গোনাহমুক্ত করবেন অথবা তাকে কিছুদিন জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করে কলুষমুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে।

➢ সকল মানুষ সুখী হতে এবং সফলতা অর্জন করতে চায়। আর এই সফলতার মধ্যে মহাসাফল্য হচ্ছে পার্থিব জগতে নেক আমল করে পরকালীন অনন্ত জীবনে জান্নাত লাভ করা।